ইবাদি মাযহাব মধ্যপন্থী, সংযত ও উদার চিন্তাধারা

শায়খ আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার



অনুবাদ

মাওলানা মুফতি হাবিব উল্লাহ বাহার

الإباضية
مذهب
إسلامي معتدل

لفقيد الإسلام علي يحيى معمر الليبي (رحمه الله)



قام بترجمته إلى اللغة البنغالية

حبيب الله بهار

Design & Print : Habib Khan
+8801857-54 67 54

ইবাদি মাযহাব

মধ্যপন্থী, সংযত ও উদার চিন্তাধারা

গ্রন্থনা

শায়খ আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার

অনুবাদ

হাবিব উল্লাহ বাহার

الإِبَاضِيَّةُ

مَذْهَبٌ إِسْلَامِيٌّ مُعْتَدِلٌ

لفقيد الإسلام العلامة علي يحيى معمر –رحمه الله–.

الأديب الليبي الكبير.

ترجمه إلى اللغة البنغالية

حبيب الله بَهار

طبع على نفقة فاعل الخير

দাওহাতুল আদব

দ্বীনি ইলম বিস্তারের একটি প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ: ০১৮২২-১০৪১৪৩

habibullahbahar4143@gmail.com

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০২৫ ঈ.

প্রুফ: জারির ইবনু কামাল ও মুশফিকুস সালেহিন

প্রচ্ছদ: হাবিব খান

بيانات الكتاب

اسم الكتاب: الإباضية مذهب إسلامي معتدل.

التأليف: الشيخ علي يحيى معمر.

الترجمة: حبيب الله بهار. المُراجعة: جرير بن كمال.

التدقيق اللغوي: مشفق الصالحين. تصميم الغلاف: حبيب خان.

عدد النسخ: ١٥٠٠. عدد الصفحات: ٤٨. تاريخ النشر: أغسطس ٢٠٢٥م.

عدد الكلمات: ٩٣٧٩، عدد الأحرف: ٤٩٣٤٧.

الورق: أصفر فاتح. الطباعة: لونان.

ملتزم الطبع: دوحة الأدب، شيتاغونغ، بنغلاديش.

বিক্রয়ের জন্য নয়

يُوزع مجانا، ولا يُباع

লেখক পরিচিতি

আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার (১৩৩৭হি/১৯১৯ ঈসাব্দ) একজন ইতিহাসবিদ, কবি, লেখক, গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি লিবিয়ার জাবাল নাফুসা অঞ্চলের নালুত শহরের তাকউয়িত গ্রামে জন্মেছেন। নালুত ঐতিহ্যগতভাবে সমৃদ্ধ একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চল।

আলি ছোটবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছেন বিখ্যাত আলিম উলামাদের সংস্রবে। ইসলামি শরিয়াহ এবং জাগতিক জ্ঞান অর্জন শেষে তিনি লেখালেখি ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের আহ্বানের জন্য পরিচিত ছিলেন।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা:

আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার ১৯১৯ সালে লিবিয়ার জাবাল নাফুসা অঞ্চলের নালুত শহরের তাকউয়িতে জন্মেছেন। ইসলামি সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চায় তার পরিবারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

পড়াশোনা:

তার প্রাথমিক পড়াশোনা সম্পন্ন হয়েছে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ আল বারুনি মাদ্রাসায়। এখানে তিনি কুরআন, আরবি ভাষা ও ইসলামি জ্ঞানসমূহের প্রারম্ভিক পাঠ নিয়েছেন। এরপর তিনি গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন।

সেসময় তিউনিসিয়া থেকে আলিমদের একটি দল জাবাল নাফুসায় আগমন করেন। তারা বিভিন্ন মসজিদে ইবাদি ফিকহ নিয়ে দারস পেশ করেন।

জ্ঞানের অভিজ্ঞতা:

সেই দলের অন্যতম শায়খ রমাদান ইবনু ইয়াহইয়া আল জারবি (১৮৬৮-১৯৪৭ ঈসাব্দ) প্রায় দুই বছর সেখানে অবস্থান করেন। আলি ১৯২৫ সালে তার হালাকায় জ্ঞান অর্জন করেন।

পরবর্তীতে তিনি যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি তিউনিসিয়ার জারবা দ্বীপে একটি নীতিরক্ষা কমিটি গঠন করেন।

১৯৩৭ সালে তিনি রাজধানী তিউনিস থেকে দক্ষিণ আলজেরিয়ার ওয়াদি মিযাবের 'করারা' শহরের আল হায়াত ইন্সটিটিউটে পড়তে যান। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সাত বছর যুক্ত ছিলেন।

১৯৪০-১৯৪৩ সময়কালে তিনি প্রখ্যাত আলিম ইবরাহিম বাইয়ুদ ও শায়খ আদ্দুনের কাছে ব্যক্তিগত উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি জন্মস্থান লিবিয়ার নালুতে ফিরে শিক্ষকতা ও আত্মশুদ্ধিতে নিযুক্ত হন। বাকি জীবন তিনি শিক্ষা, তরবিয়ত, দাওয়াহ ও লেখালেখিতে কাটিয়েছেন।

রচনাবলি:

তিনি **১৭টি বই** লিখেছেন এবং অনেকগুলো তুরাসি বইয়ের তাহকিক করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হল:

১. আল ইবাদিয়্যাহ বাইনাল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাহ (ইসলামি দলগুলোর মধ্যে ইবাদিদের অবস্থান)।

২. আল ইবাদিয়্যাহ ফি মাওকিবিত তারিখ (ইতিহাসের আলোকসভায় ইবাদিরা)।

৩. আল ইবাদিয়্যাহ মাযহাবুন ইসলামিয়্যুন মু'তাদিল (মধ্যপন্থী ইবাদি মাযহাব।

৪. সামারু উসরতিন মুসলিমাহ (মুসলিম পরিবারের খোশালাপ)।

৫. আল ফাতাত আল লিবিয়্যাহ ওয়া মাশাকিলুল হায়াত (লিবিয়ান নারী ও সামাজিক সমস্যা)।

৬. ফিলিস্তিন বাইনাল মুহাজিরিনা ওয়াল আনসার (ফিলিস্তিনের মুহাজির ও আনসারেরা)।

৭. আলিহাতুল হালওয়া (উদ্ভট উপাস্য)।

বিভিন্ন পত্রিকা ও জার্নালে তার অনেকগুলো লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এসব পত্রিকার মধ্যে রয়েছে:

১. আশ শাবাব।

২. আল মুসলিমুন।

৩. আল আযহার।

৪. আর রিসালাহ।

৫. আল মুয়াল্লিম।

৬. আল উসবু' আস সিয়াসি।

এছাড়া সে সময়ের মুসলিম বিশ্বের প্রখ্যাত আলিমদের সাথে তার বিনিময়কৃত চিঠিগুলো একত্র করলে বড়সড় একটি বই হবে।

মৃত্যু:

আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার ১৯৮০ সালের ১৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার রক্তচাপজনিত কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন। তাকে ত্রিপোলির সাইয়িদি মুনাইযির কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মন্তব্য:

ডক্টর মুহাম্মাদ মুসা বাবা আম্মি তার ব্যাপারে লিখেছেন, 'মরহুম আলি সাহেব বিনয় ও অজস্র ইলমের পাশাপাশি দূরদর্শী ও স্বপ্নদর্শী ছিলেন। তিনি সব সময় মুসলিম উম্মাহকে ছোটখাট শাখাগত বিভেদ ভুলে এক কাতারে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন।'

তাকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। বিলহাজ কাসিম আলজেরিয়ার খরুবা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চিন্তা ও কর্মপন্থা নিয়ে মাস্টার্সের থিসিস লিখেছেন। গবেষক সুলাইমান ইবনু সায়িদ আশ শাইবানি শায়খ আলির জীবনী লিখেছেন। যা ২০২৫ বইমেলায় মাস্কাট লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হবে।

বইটি লেখার ইতিবৃত্ত

এটি লেখকের জীবনের সর্বশেষ রচনা। মূলত একটি নিবন্ধ ছিল, যা প্রস্তুত করা হয়েছিল 'আরবি সংস্কৃতি বিশ্বকোষ'-এর জন্য। এরপর কিছুটা সংযোজন করে এটিকে পুস্তিকার রূপ দেওয়া হয়েছে। এটি সম্পন্ন হয়েছে ১৯৭৯ সালে।

আলজেরিয়ার আল হায়াত ইন্সটিটিউটের ফিকহ ও উসুলুল ফিকহের শিক্ষক মুহাম্মাদ ইবনুশ শায়খ জানিয়েছেন, "১৩৯৯ হিজরি সালের রমযানে আমরা লিবিয়ায় ছিলাম। তখন আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার আমাদেরকে তার এই বইটি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইবাদি মাযহাব নিয়ে এটি আমার সর্বশেষ বই। তোমরা এই বিষয়ে লেখালেখি অব্যাহত রেখো। এই মাযহাব নিয়ে মানুষের ভুল ধারণ ভেঙো।' এই সাক্ষাতের কিছুদিন পর শায়খ ইন্তিকাল করেন। বইটির একটি টাইপকৃত কপি মিসরের জাতীয় গ্রন্থাগারে নিযুক্ত শায়খ মুহাম্মাদ আতফায়্যিশের কাছে পৌঁছায়। তিনি এটি ওমানের গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আহমাদ খলিলির কাছে পাঠান। তিনি উপকারী এই পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ইতিমধ্যে বইটি আলজেরিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির শুরুতে প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মাদ বুহাজাম একটি ভূমিকা লেখেন এবং লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেন।

আমরা বইটি 'মধ্যপন্থী ইবাদি মাযহাব' নামে প্রকাশ করছি। বইটি ক্ষুদ্রাকার হলেও অত্যন্ত উপকারী। লেখক এতে ইবাদি মাযহাবের প্রতিষ্ঠা ও এর আকিদা, রাজনীতি, ফিকহ, হাদিস, সমাজদর্শনের একটি পূর্ণদৃশ্য তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন।

আহমাদ ইবনু সুয়ুদ আল সিয়্যাবি
ইফতা অফিসের মহাসচিব, ওমান।

প্রিয় পাঠক, মধ্যপন্থী ইসলামি মাযহাবগুলোর অন্যতম একটি ইবাদি মাযহাব। আগত পৃষ্ঠাগুলোতে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে:

ইতিহাসের অলিন্দে...

এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা তাবিয়ি আবুশ শা'সা জাবির ইবনু যাইদ। তিনি জন্মেছেন ২২ হিজরি সালে। ইন্তিকাল করেছেন ৯৩ হিজরি সালে। সে অনুযায়ী, ইবাদি মাজহাব প্রথম প্রতিষ্ঠিত মাযহাব। যদিও ব্যতিক্রমভাবে এই মাযহাবটি তাদের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ ইবনু ইবাদ আত তামিমির নামেই পরিচিত হয়েছে। সম্ভবত উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিককার ঘটনাপ্রবাহে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ এর মুখ্য কারণ। তিনি আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সাথে অসংখ্য পত্রবিনিময় করেছিলেন। এসব চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের পাশাপাশি থাকতো খুলাফায়ে রাশেদার পথ ও পন্থা থেকে উমাইয়া শাসনব্যবস্থার বিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হলে উমাইয়া শাসকদের রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। খারেজি, শিয়া, কদারিয়্যাসহ সকল ভ্রান্ত তরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য মুনাযারার জন্য জনসাধারণের কাছে তিনি জাবিরের চেয়েও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

ইবাদিরা নিজেদেরকে 'আহলুদ দাওয়াহ' নামে পরিচয় দিতেন। জাবিরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তারা জনগণের কাছে 'ইবাদি' নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। পরবর্তীতে এটি লোকমুখে এতটাই পরিচিত হয়ে উঠে যে তারাও বাস্তবতা মেনে নিয়ে এ নামটি গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হন।

ইবাদি মাযহাবের ২য় ইমাম আবু উবাইদা মুসলিম ইবনু আবি কারিমাহ। তিনি জাবির এবং আবুল ইয়ামানির কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। জাবির এবং আবু উবাইদার ছাত্রদের মাধ্যমে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে এই মাজহাবটি পৌঁছে

যায়। এরা 'হামালাতুল ইলম' বা জ্ঞানবাহক নামে পরিচিত হন।

ইবাদিরা লেখালেখি ও রচনায় সুপ্রাচীন। স্বয়ং জাবির এর বিশাল একটি রচনাসমগ্র ছিল, যা দিওয়ান নামে পরিচিত ছিল। এটিতে তার ফিকহ ও রাজনৈতিক দর্শন লিপিবদ্ধ ছিল। দুঃখজনকভাবে আব্বাসি আমলে এই বিশ্বকোষটি হারিয়ে যায়। রবি' ইবনু হাবিব ২য় হিজরি শতকে 'জামে আস সহিহ' সঙ্কলন করেন। এই কিতাব আজও ইবাদিদের কাছে হাদিসের সর্বপ্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হয়। এর হাদিসগুলো বুখারি ও মুসলিমের চেয়েও উঁচু মানসম্পন্ন। এর সনদগুলো 'সুলাসি' অর্থাৎ, সর্বোচ্চ কেবল তিনজন রাবি রয়েছেন। আবু উবাইদার ছাত্র আব্দুর রহমান ইবনু রুসতুম কুরআনের তাফসির লিখেছেন। হুদ ইবনু মুহাক্কামও একটি তাফসির লিখেছেন। আবুল ইয়াকযান মুহাম্মাদ ইবনু আফলাহ কেবল 'ইস্তিওয়া' বিষয়ে চল্লিশটির মতো পুস্তিকা রচনা করেছেন।

আবু গানিম বিশর ইবনু গানিম হাদিস ও আসার সঙ্কলন 'আল মুদাওয়ানা' লিখেছেন। প্রথম দুই শতাব্দীতে রচিত আরও অনেক বইপত্র রয়েছে। এরপর যুগে যুগে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় ইবাদিদের অসংখ্য রচনা রয়েছে।

ইবাদিদের লেখা সমস্ত বইপত্রের একটা সমন্বিত ক্যাটালগ করে অন্যান্য মাযহাবের আলিমদের লেখা বইপত্রের সাথে এর তুলনা করা হলে শতাংশের হিসাবে ইবাদি মাযহাবই এগিয়ে থাকবে। অব্যাহত রাজনৈতিক দমনের কারণে এর অনেকগুলো প্রায় হারিয়ে গেছে। অনেক বইপত্র আর সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গোঁড়া ফকিহরা চিন্তাগত বিরোধীদের দমনের জন্য শাসকদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিল।

ইবাদি আলিমদের রচিত অনেক গ্রন্থের কথা খোদ ইবাদিরাই জানে না। এর অন্যতম একটি কারণ যাদের কাছে এর মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রক্ষিত তারা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে এর মূলকপি নিজের

গ্রন্থাগারে তালা মেরে রেখে দেন। অস্থিতিশীল ও ভীতিকর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা গিয়েছেন, তার ফলে তাদেরকে বারবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। ফলে মূল্যবান ভারী বইপত্র বহন করা সম্ভব হয় নি। মাযহাবি সংকীর্ণতাও এর কারণ। এটা তাদের বিরোধীদের মধ্যে যেমন ছিল, তাদের মধ্যেও ছিল সমানভাবে। এছাড়া আধুনিক সময়ে অন্যান্য মাযহাবের বইপত্র সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দেশ থেকে ছাপা হয়েছে। এর জন্য গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক বিভিন্ন একাডেমী। অথচ ইবাদি মাযহাবের বইপত্র ব্যক্তি উদ্যোগে ছাপতে হচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্রাকার পুস্তিকা ছাড়া বড় কোনো বই ছাপানো যাচ্ছে না। বিশ্বকোষ আকারের বিশাল বিশাল বইগুলো বিভিন্ন সংরক্ষণাগারে পড়ে আছে। খুব শীঘ্রই এগুলো আলোর মুখ দেখবে বলেও মনে হয় না[১]।

ইসলামি শরিয়াহ ও আরবি ভাষা সংক্রান্ত যে বিপুল রচনাসমগ্র ইবাদি গ্রন্থাগারগুলোতে আছে তার সিংহভাগ এখনও অপ্রকাশিত। উদ্যমী কোনো গবেষক আগ্রহী হয়ে উদ্যোগ নিলে এর অনেকটাই প্রকাশ করা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবে।

ইবাদি মাযহাব যে সব দেশে প্রসার লাভ করে, তার অনেকগুলোতে পরবর্তীতে তারা হ্রাস হতে হতে নেই হয়ে গেছে।

---

১ লেখক মৃত্যুর আগে দেখে যেতে না পারলেও বর্তমানে আল্লাহ তায়ালা ইবাদি মাযহাবের মৌলিক ও সুপ্রাচীন কিতাবাদি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামি শরিয়াহর বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা নিয়ে রচিত বইগুলো অত্যন্ত সুদৃশ্য মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে। ওমানের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ কাজ আরম্ভ করেছিল। পরবর্তীতে ধর্মমন্ত্রণালয়ও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। আর খোদ রাজধানী মাস্কাটে কয়েক ডজন অভিজাত প্রকাশনী গড়ে উঠেছে। এছাড়া বইগুলোর ডিজিটাল কপিও ইন্টারনেটে বিদ্যমান। ফলে পাঠক খুব সহজেই এগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন।

বর্তমানে যে সব অঞ্চলে এই মাযহাবের অনুসারীরা বিদ্যমান, তার একটা বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল,

১. ওমান:

ওমানের অধিকাংশ জনগণ ইবাদি মাযহাবের অনুসারী। এখানে উমাইয়া আমল থেকে কেন্দ্রীয় খিলাফাহ থেকে আলাদা রাষ্ট্রকাঠামো বজায় ছিল। কখনও ইমামাহ, কখনও রাজতন্ত্র। কখনও আবার দুটি ব্যবস্থাই সমান্তরালভাবে বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলে জ্ঞান আন্দোলন ছিল অত্যন্ত বিকশিত। এখানের আলিমদের কেউ কেউ ৭০ থেকে ৯০ খণ্ডের মতো বিশাল কিতাব রচনা করেছেন। এগুলো এখনও আলোর মুখ দেখেনি।

ওমানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল রূপকথার মতো। এদের বিশাল বাণিজ্যিক নৌবহর দক্ষিণ এশিয়া থেকে পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত মহাসাগর দাপিয়ে বেড়াতো। পরবর্তীতে এখানে গড়ে ওঠে বিরাট একটি সামরিক নৌবহর, যা মুসলিম প্রাচ্যের সম্পদ লুট করতে আসা পশ্চিমা আগ্রাসনকে থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তাদের শৌর্যবীর্য ও দৃঢ়তার সামনে পরাজিত হয় পর্তুগিজ এবং ইংরেজরা।

২. জাঞ্জিবার:

জাঞ্জিবারের অধিকাংশ জনগণ ইবাদি মাযহাবের অনুসারী ছিল। এখানে তারা একটি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেটি ইসলামি সংস্কৃতির প্রসারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা রাষ্ট্রীয় ছাপাখানা থেকে ফিকহ, হাদিস, তাফসিরসহ ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের তাবৎ বই ছাপিয়েছিল। পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারে জাঞ্জিবারের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা ছিল। জাঞ্জিবারের সুলতানরা ওমানের সাথে মিলে ভারত মহাসাগরের উপকূলে পশ্চিমা আগ্রাসন রুখতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

তাঞ্জানিকায় সংঘটিত কমিউনিস্ট সশস্ত্র বিপ্লব তাঞ্জানিয়া দখল করে নেয় এবং সংযুক্ত দেশের নাম রাখে তাঞ্জানিয়া। কমিউনিস্টরা

মুসলমানদেরকে ব্যাপকহারে বিতাড়িত করে, সহায়সম্পদ লুটে নেয়, আলিম ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে, ইসলামি সংস্কৃতির যাবতীয় উপাদান ধ্বংস করে দেয়, অনেক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার অগ্নিসংযোগ করে সম্পূর্ণ বিনাশ করে দেয়।

৩. লিবিয়া:

এক সময় লিবিয়ার অধিকাংশ জনগণ ইবাদি থাকলেও বর্তমানে কেবল জাবাল নাফুসা এবং যাওয়ারা অঞ্চলে এই মাযহাবের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ। পশ্চিম লিবিয়ার একটি অংশে (১৩৫-১৫৫ হিজরি) সময়কালে ইবাদিরা ইনসাফ ও জবাবদিহিতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এখানে তিনজন ইমাম শাসনভার পরিচালনা করেন। স্বল্পকালীন এই রাষ্ট্র স্থায়ী হতে পারলে মুসলিম উম্মাহ সমৃদ্ধি লাভ করতো।

হিজরি ৩য় শতক থেকে ১০ম শতক পর্যন্ত সময়কালে লিবিয়ায় ইলমি মুখরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। এসময়ের আলিমরা অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকাদি রচনা করেছেন। তারা অনেকগুলো মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেগুলো শৃঙ্খলা ও শিক্ষাদীক্ষায় ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ছাত্রবান্ধব শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে দূরদূরান্ত থেকে আগত ছাত্ররা অভ্যন্তরীণ আবাসনে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো। এখানে নারীদের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দক্ষ ও স্নেহপরায়ণ শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে দূর থেকে আগত নারী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পান। ফলে জ্ঞান ও সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে প্রাজ্ঞ একদল নারী ফকিহ আবির্ভূত হন। তাদের লিখিত অনেক বইপত্র ও মতামত রক্ষিত আছে। প্রখ্যাত ফকিহদের সাথে তাদের তাত্ত্বিক বিতর্কের অনেক ঘটনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। লিবিয়ার ইবাদিরা সুদান ও চাদে ব্যবসা পরিচালনা করতেন, যা এ অঞ্চলে ইসলামের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৪. তিউনিসিয়া:

তিউনিসিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ বাসিন্দা ইবাদি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে এটি হ্রাস পেয়ে কেবল জারবাহ দ্বীপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলে উজ্জ্বল ইলমি তৎপরতা গড়ে ওঠে। পঞ্চম শতকের শুরুভাগে সাতজন আলিমের একটি দল ২৫ খণ্ডের একটি ফিকহি বিশ্বকোষ রচনা করেন, যা 'দিওয়ানুল মাশায়িখ' নামে পরিচিত হয় এবং ইবাদি মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্যগ্রন্থ বিবেচিত হয়। এর কিছু খণ্ডের পাণ্ডুলিপি মিসরের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। দশজন আলিমের আরেকটি দল 'দিওয়ানুল আযাবা' রচনা করেছেন। আর ব্যক্তিক রচনার সংখ্যা অনেক বেশি। এ অঞ্চলের আলিমরা ইবাদি ইতিহাস সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। তাদের ব্যবসায়িক দলগুলো মালিতে ইসলাম প্রসারে সবিশেষ ভূমিকা রাখে।

নিকট অতীতে ফরাসি উপনিবেশের সময়ে জারবা দ্বীপের ব্যবসায়ীরা তিউনিসিয়ার ব্যবসায় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক ছিলেন। ফলে ইহুদি ও ফরাসি বণিকদের প্রভাব সীমিত হয়েছিল। তাদের ঐকান্তিকতা, সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও দূরদর্শিতার জন্য উপনিবেশের পতনকালে তিউনিসিয়ার সম্পদ তিউনিসীয়দের হাতেই বাকি থাকে এবং যায়নিস্টদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

৫. আলজেরিয়া:

একটা সময় আলজেরিয়ার অধিকাংশ মানুষ ইবাদি মাযহাবের অনুসারী ছিল। ১৬০ হিজরি থেকে ২৯৬ হিজরি সাল পর্যন্ত ব্যপ্ত 'রুস্তুমি' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিহার্ত শহর ছিল এর রাজধানী। ছয়জন ইমাম এই রাষ্ট্র শাসন করেছেন। এটি দক্ষিণ তিউনিসিয়া ও পূর্ব লিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। "আলজেরিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" বইয়ে জনাব ইয়াহইয়া বুআযিয লিখেছেন, 'এই রাষ্ট্র শুরাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত ছিল। ইমামরা কুরআন ও

সুন্নাহর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতেন। তারা পুরো রাষ্ট্রের চেহারা বদলে দিয়েছিলেন। আরব সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যহারে প্রসার লাভ করেছিল। বাণিজ্য, কৃষি ও নগরসভ্যতার সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। রুস্তুমিদের হাতে পুনর্নির্মিত ও সম্প্রসারিত তিহার্ত শহর হয়ে উঠেছিল বাণিজ্য কাফেলার মিলনমেলা। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতো।'

রুস্তুমি রাষ্ট্র ঐশ্বর্য ও গৌরবের শীর্ষে পৌঁছেছিল। নিরাপত্তা, ন্যায়, চিন্তার স্বাধীনতা, শিক্ষার প্রসার, মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দক্ষিণের রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সাথে সম্পন্ন হয়েছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চুক্তিসই। ফলে জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। সর্বত্র সুখ বিরাজিত হয়েছিল। তবে এটি যেন অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিলাসিতা বিস্তারের কারণ না হয় সে জন্য রাষ্ট্র স্থির ও কঠোর নীতি অবলম্বন করেছিল।

রুস্তুমি ইমামরা ছিলেন খোদাভীরু আলিম। তারা শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই রাষ্ট্রের পতনের পর ইবাদিরা তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী মরূদ্যানসমূহে আশ্রয় নেয়। এখানেও তারা সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সাধন করে। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য তাদের উপস্থিতি ওয়ারজালান এবং মিযাব উপত্যকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এখানে তারা অনুপম এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই সমাজ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছিল। আলজেরিয়ায় উসমানীদের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে মিযাবের ইবাদিরা তাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, উসমানীরা তাদের এলাকায় প্রবেশ করবে না, স্বয়ং ইবাদিরাই তাদের উপর আরোপিত কর রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দেবে।

পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকা দখল করে নেওয়ার পর একই পন্থায় তারা আত্মরক্ষামূলক চুক্তি করে নেয়।

যদিও ফ্রান্স সময়ে সময়ে এই চুক্তির অনেকগুলো ধারা ভঙ্গ করে। উপনিবেশবিরোধী বিদ্রোহ শুরু হলে ইবাদিরা পুরো দেশবাসির সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে সর্বান্তকরণে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর জনগণ গৌরবান্বিত অতীতের ভিত্তির উপর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য একমত হয় এবং এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও বিচারতান্ত্রিক ক্ষমতা আলজেরিয়ার সরকার গ্রহণ করেছে।

ইবাদিদের উপস্থিতি যে সব স্থানে রয়েছে, সেগুলো জ্ঞানচর্চায় বিরতিহীন। শিক্ষাদীক্ষায় তারা নিজস্ব একটি নজিরবিহীন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, যেটি 'আযযাবাহ' নামে পরিচিত। এটি সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষানৈতিক ব্যাপক একটি ব্যবস্থা, যা এখনও অনেকটা সক্রিয়।

পঞ্চম হিজরি শতকে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থাটি আদর্শ শিক্ষাদর্শনের এক ঐতিহাসিক দলিল। এই ব্যবস্থায় সকল অধিবাসী অভিন্ন পোশাক পরিধান করতো। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো। ছাত্রদের প্রায়োগিক শিক্ষা অর্জন ও নেতৃত্বের গুণ শেখার জন্য শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হতো। এটি অবশ্যই বর্তমান অত্যাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মতো ছিল না, তবে নিজ যুগের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল অবশ্যই। এর অনেকগুলো চিন্তা ও দর্শন বর্তমান সময়ের মনস্তত্ত্ববিদদের নির্দেশ করতে দেখা যায়।

৬. অন্যান্য স্থান:

বর্তমানে আফ্রিকার ঘানা, মালিসহ কিছু দেশে ইবাদি মাযহাবের ক্ষুদ্র উপস্থিতির কথা জানা যায়। এছাড়া ইউরোপের কোনো কোনো জায়গায় ইবাদি অনুসারী থাকার কথা শোনা গেছে।

ইবাদিরা খারেজি নয়

মতবাদ বিষয়ে লিখিত বইগুলোতে ইবাদিদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। তাদেরকে খারেজি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ খারেজিদের সাথে তাদের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের

বইগুলোতে ইবাদিদের উপর নানা রকমের অপবাদ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইবাদিদেরকে নানা উপদলে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির কল্পিত প্রতিষ্ঠাতার নামে বিভিন্ন অসত্য কথা আরোপ করা হয়েছে, যেগুলো কোনো ব্যক্তি কাফের হওয়ার জন্য আলবত যথেষ্ট। অথচ না এসব উপদলের অস্তিত্ব আছে, না এর প্রবক্তাদের। ইবাদিদের সাথে এসকল বক্তব্যের কোনো যোগ নেই। ইবাদিরা এসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তারা হাফসিয়্যাহ, হারিসিয়্যাহ, ইয়াযিদিয়্যাহ- ইত্যাদি উপদলের নাম উল্লেখ করেছেন এবং এর প্রবক্তাদের ইবাদি বলে উল্লেখ করেছেন। নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো দেখুন। এসবই ইবাদিদের নামে জালিয়াতি করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১. আল্লাহকে চেনাই একজন ব্যক্তির মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এরপর সে রসূল, জান্নাত, জাহান্নামকে অস্বীকার করলেও মুশরিক হবে না, হবে কাফির।

২. আল্লাহ অচিরেই অনারবদের মধ্যে একজন নবি পাঠাবেন, যাকে এক দফায় একটি আসমানি কিতাব দেওয়া হবে।

৩. কেউ ইহুদি-খ্রিস্টান থেকেও রসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে মুমিন গণ্য হবে।

আপনি এই বইগুলোতে এ ধরনের আরও অনেক বক্তব্য দেখবেন, যা অন্যায়ভাবে ইবাদিদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ ইবাদিরা নিজেরাও এসব বক্তব্যে বিশ্বাসীকে সুস্পষ্ট কাফির ও মুশরিক গণ্য করে। সম্ভবত এর লেখকেরা খারেজিদের যত বক্তব্য পেয়েছে, সবই ইবাদিদের নামে চালিয়ে দিয়েছে; কারণ তাদের পূর্বধারণাই হল ইবাদিরা খারেজি। তারা বলেছে, ইবাদিরা ইজমা, রজম ও কবরের আযাবকে অস্বীকার করে।

অথচ ইবাদিরা অন্য সবার মতোই ইজমাকে শরিয়তের তৃতীয় মূলনীতি মনে করে। রজমকে তারা অস্বীকার করে না। এটি

কুরআনের রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত দ্বারা নয়; বরং তারা মনে করে এটি রসূলুল্লাহর কথা ও কাজ দ্বারা সাব্যস্ত। তারা কবরের আযাব এবং দুইজন ফিরিশ্‌তার জিজ্ঞাসাবাদকে অসংখ্য হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত মনে করে।

মতবাদ বিষয়ে লিখিত বইয়ের লেখকেরা যুদ্ধনীতির ক্ষেত্রেও ইবাদিদের নামে মিথ্যা বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। যেমন,

১. ইবাদিরা মুসলমানদের ঘোড়া ও অস্ত্রকে গনিমত মনে করে।

২. বিরোধীদের হত্যা করাকে তারা ভেতরে ভেতরে হারাম বললেও, বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের হত্যা করাকে তারা জায়েজ মনে করে।

৩. তাওবা না করলে বিরোধীদের হত্যা করা হবে, চাই যত ছোট বিষয়েই সে ভিন্নমত পোষণ করুক।

৪. যারা ব্যভিচার বা চুরি করবে তাদের উপর হদ বাস্তবায়ন করা হবে, এরপর তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা না করলে হত্যা করা হবে।

অথচ ইবাদিরা মুসলমানদের কোনো ধরনের সম্পদকেই গনিমত মনে করে না। কাবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তারা তাওবার আহ্বান জানায়। তাওবা করলে তারা তাকে নিজেদের একজন মনে করে। তাওবা না করলে তারা তাকে মুসলমানদের সাধারণ অধিকারগুলো প্রদান করে। কিন্তু কখনোই তারা তাকে হত্যা করাকে বৈধ মনে করে না। কিন্তু কেউ যদি সম্পূর্ণ দ্বীনকেই অস্বীকার করে তবে সে মুরতাদ। তাকে হত্যা করা হবে। এই মত সকল মধ্যপন্থী ইসলামি মাযহাবের। তারা তাদের বিরোধীদের হত্যা করাকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে হারাম মনে করে। কারণ তাওহিদের কালিমা ব্যক্তির জানমাল, পরিবার ও সম্মানকে অলঙ্ঘনীয় নিরাপত্তা দেয়।

ইবাদিরা মনে করে চুরির শাস্তি হাত কাটার পর তাকে পাকড়াও করার আর সুযোগ নেই। কেউ ব্যভিচার করলে বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে, আর অবিবাহিত হলে দোররা

মারা হবে। এরপর তাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। হ্যাঁ, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে কিনা এটি নিয়ে মতভেদ আছে। সুতরাং হদ আল্লাহ নির্ধারিত বিধান। এটিকে লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই।

মোদ্দাকথা, মতবাদ বিষয়ে লিখিত বইয়ের লেখকেরা ইবাদিদের নামে যা উল্লেখ করেছেন, তা অসত্য ও ভিত্তিহীন। আকিদার বইগুলোর পাশাপাশি ইতিহাসের বইগুলোতেও তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তাদেরকে খারেজিদের শাখা বলা হয়েছে। এ কাজ সমান্তরালভাবে সম্পন্ন করেছে উমাইয়া ও শিয়া মিডিয়া। খারেজিদের নামে যেসব চরমপন্থা, বদমেজাজ ও চিন্তানৈতিক স্থবিরতার কথা প্রচলিত- তার সবই ইবাদিদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ইবাদিরা তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে কখনোই চরমপন্থী কোনো সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়নি। কেবল আত্মরক্ষার জন্যই তারা কখনো কখনো অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল।

এমনকি যখন তারা নিজেদের আদর্শের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন তখনো তারা শান্তিপূর্ণ পন্থায় নিজেদের আদর্শের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কোনো রক্তপাতের আশ্রয় নেননি। বরং লিবিয়ায় তিনবার তারা ইমামাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিবারই তারা সাবেক শাসককে অন্য দশজন মুসলিমের মতো নিজের অধিকার নিয়ে রাজ্যে বসবাস অথবা নিজের সহায়সম্পত্তি ও পরিবার নিয়ে নিরাপদে প্রস্থানের সুযোগ দিয়েছিলেন। রুস্তুমি রাষ্ট্রও একইভাবে শান্তিপূর্ণ তরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৫৪ হিজরি সালে লিবিয়ায় তাদের সর্বশেষ শাসনের অবসান ঘটলে তারা পরবর্তী আর কোনো শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি।

একইভাবে আলজেরিয়ায় ২৯৬ হিজরি সালে রুস্তুমি রাষ্ট্রের পতনের পর তারা আর কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নামেননি। এতদসত্ত্বেও ঐতিহাসিকরা তাদেরকে দয়া করেন নি। তাদের নামে চরমপন্থার বিভিন্ন ভুয়া অভিযোগ করেছেন। মতবাদ বিষয়ে লিখিত

বইয়ের লেখকদের মতোই ঐতিহাসিকরাও একই কথা বারবার আওড়েছেন। একটা কথাই বলা হয়েছে যে, ইবাদিরা সর্বপ্রকারে জালিম শাসকদের সরানোর জন্য সচেষ্ট ছিল। যেমন, একজন লিখেছে, 'যতদিন ইবাদিরা বেঁচে থাকবে ততদিন মুসলিম উম্মাহর তরবারি কোষবন্ধ হওয়া সম্ভব নয়।'!

ইবাদিদের রাজনৈতিক আদর্শ

ইবাদিরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারে বিশ্বাসী। এজন্য তারা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে খারেজি, শিয়া, তাওয়াবুন, ইবনুয যুবাইর ও ইবনুল আসয়াসের মতো সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশ নেন নি। অবশ্য তারা উমাইয়া শাসকদের শরিয়তবর্জিত কার্যকলাপের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

খারেজিরা নানা ফন্দি করে আবদুল্লাহ ইবনু ইবাদকে তাদের দলে টানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, যে সকল মুসলমানের মিনারে আজানের ধ্বনি ওঠে, মসজিদে ওঠে কুরআন তিলাওয়াতের সম্মিলিত অনুরণন- তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা সম্ভব নয়।

ইবাদিদের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সশস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তালিবুল হক আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া আল কিন্দি। এটি ছিল সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ। ইবনু আবিল হাদিদ শরহু নাহজিল বালাগায় (৫/১০৬) লিখেছেন, 'কিন্দি ইয়েমেনে সীমাহীন অনাচার লক্ষ্য করে তার অনুসারীদের বললেন, যে অবস্থা বিরাজ করছে তা অসহনীয়। কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বসরা ও অন্যান্য এলাকার ইবাদিদের কাছে পরামর্শ প্রত্যাশা করেন। তাদের প্রত্যুত্তর ছিল, তোমার যদি মনে হয় জুলুমের পরিমাণ এতই বেড়েছে যে, আর একটা দিনও সবর করার সুযোগ নেই তাহলে ময়দানে নামতে পারো।' এ সশস্ত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ইতিহাস ও সাহিত্যের বইগুলোতে বিস্তারিত বিধৃত। সম্ভবত এটিই

তাদের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সশস্ত্র পদক্ষেপ। এই একটি যুদ্ধেই তারা নিজেরা প্রথমবারের মতো আক্রমণ শুরু করেছিল।

* ইবাদিদের রাজনৈতিক দর্শনের একটা ধারণা নিচের পয়েন্টগুলোতে পাওয়া যাবে।

১. ইমামত প্রতিষ্ঠা করা ফরজ। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধকে বাস্তবায়ন করার জন্য। ইনসাফ ও হক প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য।

২. ইমাম হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশের হওয়া বা আরব হওয়া শর্ত নয়। যোগ্যতাই মুখ্য। হ্যাঁ, সমান যোগ্যতা সম্পন্ন একাধিক ব্যক্তি থাকলে কুরাইশি বা আরব হওয়া অতিরিক্ত গুণ বিবেচিত হবে।

৩. ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ।

৪. জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব নয়- যেমনটা খারেজিরা বলে থাকে। নিষিদ্ধও না যেমনটা আশয়ারি ও সালাফিরা বলে থাকে। এটি মূলত জায়েজ। সাফল্যের ধারণা প্রবল হলে এটি করা উচিত। আর ব্যর্থতার আশঙ্কা প্রবল হলে অথবা এর ফলে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া বা কাফিরদের সুযোগ তৈরি হওয়ার শঙ্কা থাকলে বিদ্রোহ না করা যাবে না।

ইতিহাস এবং মতবাদ বিষয়ে লিখিত বইপত্র পড়লে ধারণা হতে পারে ইবাদিরা জালিম শাসক বলতে কেবল তাদের বিরোধীদেরকে বুঝে। কিন্তু বাস্তবতা হল তাদের দৃষ্টিতে যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় তারাই জালিম। যে মাযহাবেরই হোক না কেন সে।

৫. শুরা পদ্ধতির মাধ্যমে ইমাম বেছে নেওয়া হবে। নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশের মতামত এক্ষেত্রে ধর্তব্য।

৬. প্রাদেশিক গভর্নরদের কাজের দায়ভার ইমামের উপর বর্তাবে। তাকে অবশ্যই যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করতে হবে। তিনি নিয়োগ ও বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকার নেতৃস্থানীয় ও জ্ঞানী লোকজনের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

৭. ইমাম বা সুলতান পদে শূন্যতা বিরাজ করতে দেওয়া হারাম।

৮. জালিম শাসককে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হবে। পরবর্তী ধাপে তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানানো হবে। সে রাজি না হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ। হ্যাঁ, দেখতে হবে যেন এই পদক্ষেপ আরও বড় সমস্যার সৃষ্টি না করে।

৯. জালিম শাসক ইবাদি হোক বা না হোক, সে বা তার সহযোগীদের সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক নেই। তার সেনাদেরকে শরয়ি দৃষ্টিকোণে বিদ্রোহী গণ্য করা হবে।

১০. বিরোধী মুসলমানদের দেশ ইসলামি দেশ বিবেচিত হবে। যদিও এর শাসক জালিম হয়।

১১. নির্দিষ্ট সীমারেখায় স্থাপিত মুসলিম রাষ্ট্রের উপর কোনো আক্রমণ বৈধ নয়। তবে তারা কোনো আক্রমণ করলে, সেটি প্রতিরোধ করা বৈধ।

১২. পৃথিবীর বিস্তৃত মানচিত্রে একাধিক ইমামত প্রতিষ্ঠিত হতে কোনো বাধা নেই। বিশেষ করে যদি এক সরকারের অধীনে শাসন করা সম্ভব না হয় অথবা একাধিক ভূখণ্ড শত্রুরাষ্ট্র দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়।

১৩. ইবাদিদের মতে মুসলিম ভূখণ্ড চার ধরনের:

ক. দারুল ইসলাম তথা মুসলিম ভূখণ্ড। সেনাবাহিনী মুসলমান। রাষ্ট্র ইসলামকে বাস্তবায়ন করে।

খ. দারুল ইসলাম তথা মুসলিম ভূখণ্ড। সেনাবাহিনী ও জনগণ মুসলমান। কিন্তু রাষ্ট্র ইসলামকে প্রয়োগ করে না। চাই এটি ইবাদিদের হোক বা বিরোধীদের।

গ. দারুল ইসলাম তথা মুসলিম ভূখণ্ড। সেনাবাহিনী কাফির যেমন, ঔপনিবেশিক কোনো শক্তি। অথচ জনগণ মুসলমান। চাই সেই কাফির শক্তি ইহুদি-খ্রিস্টান হোক, অথবা মুশরিক।

ঘ. দারুল কুফর তথা অমুসলিম ভূখণ্ড। সেনাবাহিনী কাফির।

অধিকাংশ জনগণও কাফির।

ইবাদিদের আকিদা

ইবাদিদের আকিদার মূলনীতি হল আল্লাহ তায়ালার নিরঙ্কুশ পবিত্রতা ঘোষণা করা। কুরআন এবং হাদিসের যে সব অংশ বাহ্যিকভাবে বান্দার সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য বোঝায় তা অবশ্যই ব্যাখ্যাযোগ্য। আর সেই ব্যাখ্যা হবে আল্লাহ তায়ালার শানের উপযোগী।

১. ঈমান তিনটি অবিচ্ছেদ্য অংশ নিয়ে গঠিত। আন্তরিক বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও সে অনুযায়ী আমল করা।

২. আল্লাহ তায়ালার সিফাত (যাতি) নিজস্ব, যায়িদ বা অতিরিক্ত নয়। এটি আল্লাহর মাঝে দেহ ধারণ করে না।

৩. আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার ও শাস্তির ঘোষণায় সত্যবাদী।

৪. জান্নাত এবং জাহান্নামে মানুষ চিরস্থায়ীভাবে প্রবেশ করবে।

৫. তাওহিদের কালেমা হল: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও রসূল এবং তিনি যেসব বিধান নিয়ে এসেছেন, তার সবই যথার্থ। এই তিনটির কোনো একটিকে অস্বীকার করলে সেই ব্যক্তি কাফির হিসেবে গণ্য হবে।

৬. দ্বীনের হুকুম বলে যা অকাট্যভাবে জ্ঞাত, তা অস্বীকার করা শিরক।

৭. কুরআন আল্লাহর কালাম। মুতাওয়াতির তথা অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় বর্ণিত। এর কোনো অংশ অস্বীকার করা শিরক।

৮. পুলসিরাত জাহান্নামের উপর স্থাপিত বাস্তব কোনো পথ নয়। এটি হল ইসলামের সরল পথ ও পন্থা, যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য পছন্দ করেছেন। এটি তরবারির চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম মর্মে যে বর্ণনা এসেছে, তা যদি শুষ্ক হয়ে থাকে, তবে এর উদ্দেশ্য হল সেসব ভয়ঙ্কর ফিতনা ও প্রবৃত্তি যা ইসলাম পালনের

পথে বাধার সৃষ্টি করে।

৯. মানুষ তার কর্মে স্বাধীন, কর্মের জন্য দায়ী। সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কাজ করতে মজবুর নয়, নিজের কাজের স্রষ্টাও নয়।

১০. ইসতিতায়াহ বা কাজের ক্ষমতা কাজ শুরু করার সাথে সাথে তৈরি হয়। আগেও নয়, পরেও নয়।

১১. নেককার লোকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং পাপী লোকের কাছ থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তিকে আমরা ভালো কাজে অবিরত দেখবো, যার ব্যাপারে আমরা ভালো শুনবো- তার সাথে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবে। আর যাকে আমরা খারাপ কাজে অবিরত দেখবো, যার ব্যাপারে আমরা খারাপ শুনবো- তার সাথে আমাদের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করবো।

১২. তাওবা ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য শর্ত। অতএব কোনো কাবিরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। হ্যাঁ, সগিরা গুনাহ বিভিন্ন উপায়ে মাফ করা হয়। যেমন, কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা, নেক কাজ করা। হাদিস শরিফে এসেছে, "গুনাহের কাজের পর ভালো কাজ করো। এটি তাকে মিটিয়ে দিবে।"

১৩. মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত: মুমিন অথবা কাফির। মধ্যবর্তী কোনো স্তর নেই।

১৪. আখিরাতে যে একবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছে, সে আর কখনো দুর্ভাগা হবে না। একইভাবে যে একবার দুর্ভাগা হবে, সে আর কখনো সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হবে না। অর্থাৎ, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য একত্র হবে না।

১৫. নিফাক ঈমান এবং শিরকের মধ্যবর্তী একটি স্তর। অর্থাৎ, তারা দুনিয়াবি হিসেবে মুসলমানদের হুকুম প্রাপ্ত হবে। আর আখিরাতে মুশরিকদের সাথে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ মুনাফিক নরনারীদেরকে শাস্তি দিবেন। আর মুমিন নরনারীদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'

১৬. এক আল্লাহয় বিশ্বাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে কুফর শব্দ ব্যবহার করলে এর অর্থ হবে, কুফরুন নি'মাহ- অর্থাৎ, আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার, শিরক নয়। যেমন, হাদিসে বলা হয়েছে, 'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি, মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফর'। অন্য হাদিসে এসেছে, 'আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না। একজন আরেকজনকে হত্যা করতে যেও না'। আরো বলা হয়েছে, 'ঘুষ নিয়ে বিচার করা কুফর।'

১৭. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধাপ্রদান করা ওয়াজিব।

১৮. রসূলুল্লাহ (সা) এর শাফায়াত বা সুফারিশ সত্য। এবং এটি কেবল দুই ধরনের। শাফায়াতে কুবরা বা মাকামে মাহমুদ, যা একমাত্র তাকেই দেওয়া হবে। অন্যটি হল, নেককার পরহেজগার মুমিনদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ। এবং এটি শাফায়াতে সুগরা।

১৯. আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে আদেশ পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যখন তার কাছে রসূল পাঠানো হয়, অথবা কিতাব দেওয়া হয়।

২০. হাসান বা সুন্দর হলো, যা শরিয়ত সুন্দর ঘোষণা করেছে; আর কবিহ বা অসুন্দর হল যা শরিয়ত খারাপ বলেছে।

ইবাদিদের ফিকহের নীতি

ইবাদিদের কাছে শরয়ি বিধানাবলি নির্ধারণের চারটি উৎস: কুরআন, হাদিস, ইজমা' এবং কিয়াস ও ইস্তিদলাল। ইস্তিদলালের আওতাধীন প্রকারগুলো হল: ইস্তিসহাব, ইস্তিহসান ও মাসালিহ মুরসালাহ। তারা অনেক সময় ইজমা, কিয়াস ও ইস্তিদলালকে একসাথে 'রায়' বলে থাকেন। ফলে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছেন, ইবাদিরা ইজমাকে অস্বীকার করে। নিম্নে ইবাদিদের উসুলুল ফিকহ সংক্রান্ত মতামতসমূহ তুলে ধরা হল:

১. আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের যে সকল বিধান কুরআন ও সুন্নাহয় বিধান আকারে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আমাদের জন্যও

বিধান; যদি তার রহিত হওয়ার কোনো প্রমাণ না থাকে।

২. যদি ইজমায়ে কওলি বা ফকিহদের সকলের মৌখিক অভিন্ন মতের মাধ্যমে কোনো বিধানের বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়, সেটি অকাট্য। কিন্তু ইজমায়ে সুকুতি বা কারো কারো মৌনসম্মতিসহ কোনো বিধানের বিষয়ে ঐক্যমত্য হলে, সেটি অকাট্য নয়।

৩. খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে আমল করা যাবে। কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে এটি প্রমাণ নয়; কারণ আকিদার ক্ষেত্রে অকাট্য দলিল প্রয়োজন।

৪. মদিনাবাসির কাজ বা ঐক্যমত্যের আলাদা কোনো গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ, এটি শরয়ি প্রমাণ নয়।

৫. সাহাবির ব্যক্তিগত ইজতিহাদ অন্য কারো জন্য আবশ্যক নয়।

৬. যদি রসূলুল্লাহ (সা.) এর কথা ও কাজের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, এবং কোনোভাবেই সমন্বয় করা সম্ভব না হয় তবে বক্তব্য অগ্রগণ্যতা পাবে। কারণ কাজ বিশেষায়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭. যা ছাড়া ওয়াজিব কাজ আদায় করা যায় না, তাও ওয়াজিব।

৮. যে বিষয়ের হুকুম কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, সে বিষয়ে লোকজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। এর আওতাভুক্ত সিফফিনের যুদ্ধের পর সালিশ নির্ধারণের বিষয়টি।

৯. সাহাবিদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে তাদের তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে:

ক. সকল সাহাবি ন্যায়পরায়ণ। তবে যাদেরকে কুরআনে ফাসিক ঘোষণা করেছে, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, উকবাহ ইবনুল ওয়ালিদ ও সা'লাবাহ ইবনু হাতিব।

খ. সকল সাহাবি ন্যায়পরায়ণ এবং তাদের হাদিস গ্রহণযোগ্য। তবে যারা ফিতান তথা যুদ্ধে জড়িয়েছেন, ফিতান বিষয়ে তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

গ. সাহাবি অন্য দশজন মানুষের মতোই। যাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত তারা ন্যায়পরায়ণ। আর যাদের অবস্থা জানা যায় না, তাদের অবস্থা যাচাই করা হবে।

১০. ইবাদত সংক্রান্ত যে সকল কাজ রসূলুল্লাহ (সা.) নির্দিষ্ট হেতুবশত করেছেন বা একবারই করেছেন অথবা তিনি অব্যাহতভাবে করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি- সেটি সুন্নত বলে সাব্যস্ত হয় না ইবাদিদের কাছে। এটি বিশেষ অবস্থা, যা কেবল অনুরূপ অবস্থায় প্রয়োগ করা যেতে পারে রসূলুল্লাহকে অনুসরণের উদ্দেশ্যে। এজন্য তারা এই বিষয়গুলোকে সুন্নত বলেন না:- নামাজে কুনুত পড়া, তাকবির বলার সময় হাত উত্তোলন করা, তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল নাড়ানো, সূরা ফাতিহার পর জোরে আমিন বলা, ফজরের আযানে 'আস সলাতু খইরুম মিনান নাওম' বলা।

১১. অকাট্য বিষয়ে মতভেদকারীদের মধ্যে একজন সঠিক, অন্যজন ভুল ও গুনাহয় লিপ্ত। আর শাখাগত ফিকহি মাসয়ালায় যখন মতভেদ হয়, মাগরেব অঞ্চলের ইবাদিগণ এবং ইবনু বারাকার মতে, একজন সঠিক এবং তার জন্য দ্বিগুণ নেকি, অন্যতম ভুল এবং তার জন্য একটি নেকি চেষ্টা করার কারণে। অন্যদিকে মাশরেক অঞ্চলের ইবাদিগণ এবং আবু ইয়াকুব ওয়ারজালানির মতে উভয়জনই সঠিক২।

ফিকহি সমাধান বের করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়:

- যে স্থানে অনুমুতি নিয়ে প্রবেশ করবে, সেখানে নামাজ পড়া বৈধ; যদিও তার জন্য আলাদা অনুমুতি নেওয়া না হয়।

---

২ মাশরেক: আরব উপদ্বীপ এবং ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও দখলীকৃত ফিলিস্তিন। মাগরেব: মরক্কো, মৌরিতানিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও তিউনিসিয়া।

- অবৈধভাবে দখল করে নেওয়া হলে নির্মাণ বৈধ হয়ে যায় না।
- মুসাফির যতদিন সফরের নিয়ত মনে মনে রাখবে ততদিন সে মুসাফির বলে গণ্য হবে।
- যে সকল কাজ ভুলে করলে নামাজ ভাঙ্গে না, সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে করলে নামাজ ভেঙে যাবে; যদি নামাজ শুদ্ধ করার জন্য না হয়।
- কবরস্থান সর্বসাধারণের জন্য। যদি না নির্দিষ্ট কারো মালিকানাধীন হয়।
- যা গায়ে দিয়ে নামাজ পড়া যায় না, তা বিছিয়ে তার উপরও নামাজ আদায় হবে না।
- দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা যাবে; তবে এটি অকাট্য নয়।
- ভবিষ্যৎ কসমের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বললে তার প্রভাব আছে। কিন্তু অতীতের ক্ষেত্রে তা নয়।
- স্ত্রীর সাথে কেবল একাকীত্বে সময় কাটালেই ইদ্দত এবং পূর্ণ মোহর আবশ্যক।
- সন্তান তার পিতামাতার মধ্যে যে মুসলমান, তার অনুগামী বলে গণ্য হবে।
- যা ঐকমত অনুযায়ী হারাম, তা বিক্রি করা এবং বিক্রয়মূল্য ভোগ করা জায়েয নেই।
- প্রতিটি বিষয় তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিবেচ্য।
- অকাট্য বিশ্বাস নিছক ধারণার ফলে বাদ দেওয়া যায় না।
- মূল হল দায়িত্বমুক্তি। ব্যক্তির দায় প্রমাণ করতে দলিল লাগবে।
- দাবিকারি প্রমাণ উপস্থাপন করবে, আর বিবাদী কসম করবে।
- প্রমাণ ব্যাপক দলিল, স্বীকারোক্তি সীমিত দলিল।
- ফায়দা ভোগের সমান্তরাল ক্ষতিরও দায়িত্ব নিতে হবে। লাভ এবং জরিমানা একই মুহূর্তে একই কারণে সাব্যস্ত হবে না।

- ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা করা বৈধ নয়।
- প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধতা দেয়। এবং এটি প্রয়োজন পরিমাণই বৈধ।
- কল্যাণ সাধনের চেয়ে অকল্যাণ দূর করা অগ্রগণ্য।
- অসহনীয় কষ্ট সহজতা আনে।
- দলিল দ্বারা সাব্যস্ত বস্তু চাক্ষুষ সাব্যস্ত বস্তুর মতো।
- শরয়িভাবে কোনো কিছু বৈধ সাব্যস্ত হলে সেটিতে যেমান আসবে না। অসিয়ত সাব্যস্ত না হলে এর সম্পদ আত্মীয়কে ফেরত দেওয়া হবে।
- মিরাসের মালকে সাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া জায়েজ নেই, আবার গনিমতের মালকে মিরাস বানানোও জায়েজ নেই।

এ ধরনের আরও অনেক ফিকহি সাধারণ নিয়ম ফিকহ ও উসুলুল ফিকহের কিতাবাদিতে তালাশ করলে পাওয়া যাবে।

ইবাদিদের সামাজিক সম্পর্ক নীতি

ইবাদিদের আন্তসম্পর্ক ও বহির্সম্পর্ক কেমন হবে তা আবু হামযা মুখতার ইবনু আওফের ভাষণে একটি সুন্দর বাক্যে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'সকল মুসলমান আমাদের ভাই। তবে যারা মুশরিক, ইহুদি-খ্রিস্টান অথবা অন্যায়ে অবিচল শাসক।' এটিকে দুটি উপশিরোনামে স্পষ্ট করা যায়:

রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক:

ক. রাষ্ট্র ইবাদি মাযহাব দ্বারা পরিচালিত হলে অন্যান্য মাযহাবের লোকদের সাথে তার আচরণ হবে নিম্নরূপ:

১. তারা যে সকল ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী তা ত্যাগ করার জন্য সুন্দর প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় নসিহত করা হবে। তারা মেনে নিলে আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর অস্বীকৃতি জানালে তাদের উপর আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়িত হবে। যেমন, বিচার মেনে নেওয়া, রাষ্ট্রের আনুগত্য করা। আর রাষ্ট্রও তাদেরকে সমান সুযোগ-সুবিধা ও

অধিকার প্রদান করবে।

২. সকলের জন্য ন্যায়বিচার সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৩. গনিমত, ফাই ও সদকায় তারা সমান অধিকারী।

৪. রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৫. রাষ্ট্র তাদের জান-মাল ও সম্পদ রক্ষা করবে।

৬. যোগ্যতা অনুযায়ী তারা রাষ্ট্রের যে কোনো পদ লাভ করতে পারে।

৭. তাদের কেউ যদি তার কর্তব্য পালন না করে তাকে উপযুক্ত শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।

৮. যারা বিশৃঙ্খলার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ এবং তাকে হত্যা করা হবে।

৯. ইবাদি সুলতানকে মেনে নেওয়ার পর তারা যদি তাদের অঞ্চলে নিজস্ব তরিকায় বিচার পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তার সুযোগ দেওয়া হবে। যতক্ষণ না অকাট্য কোনো আয়াত বা হাদিসকে অস্বীকার করে।

১০. তাদের মধ্য থেকে বিচারক বাছাই করা হবে, যে তাদের কথা শুনবে এবং অধিকার আদায় করবে।

১১. তাদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদের মধ্যকার দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে।

১২. তারা বিদ্রোহে অভিযুক্ত হলে তাদেরকে ক্ষমাপ্রদর্শন করা হবে।

খ. রাষ্ট্র অন্য মাযহাব দ্বারা পরিচালিত হলে রাষ্ট্রের সাথে ইবাদিদের সম্পর্ক হবে নিম্নরূপ:

১. তারা রাষ্ট্রের অধীনে মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রারম্ভিক এবং আত্মরক্ষামূলক উভয় ধরনের জিহাদেই অংশগ্রহণ করবে।

২. সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণ ইমামত ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রও যদি তাদের রাষ্ট্রের উপর হামলা চালায়, তবে তারা দেশের পক্ষে লড়বে।

৩. ইবাদিরা সবধরনের চাকরিতে যোগ দিবে। তবে চাকরিটি যদি অন্যায় প্রতিষ্ঠা বা গুনাহের ক্ষেত্র হয় তাহলে তাতে যোগ দেওয়া বৈধ নয়।

৪. ইবাদিদের কেউ নিজেকে যোগ্য মনে করলে বিচার, প্রশাসনসহ যে কোনো চাকরিতে যোগ দিতে পারে জুলুমের অংশীদার না হওয়ার শর্তে।

৫. মসজিদ, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি পরিচালনার ভার তারা গ্রহণ করতে পারে।

৬. যদি কেউ হদ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়, তাকে অবশ্যই বিচারের স্বচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত করতে হবে।

৭. গুনাহের কাজে শাসকের আনুগত্য বৈধ নয়। আল্লাহকে অমান্য করে কাউকে মান্য করতে পারে না মুমিন।

৮. ইবাদিদের উপর শরিয়তের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। আইনি বিষয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত মাযহাবের ফয়সালা অনুযায়ী তাদের উপর দায়িত্ব বর্তাবে এবং তারা সুযোগপ্রাপ্ত হবে। যদিও সেই সিদ্ধান্ত ইবাদি মাযহাবের বিরোধী হয়।

৯. রাষ্ট্রের মাযহাব অনুযায়ী একবার যে আর্থিক হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে, তা রাষ্ট্র বদলে গেলেও বদলাবে না।

১০. রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসরণ করতে হবে। মাযহাবে সীমাবদ্ধ থাকবে না এটি।

ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক:

১. পিতামাতা, আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির, প্রতিবেশী ও বন্ধুর অধিকার প্রদান করা হবে। চাই তারা নেককার হোক অথবা গুনাহগার। ইবাদি হোক বা না হোক।

২. আমানত আদায় করতে হবে। চাই সে ইবাদি হোক বা না হোক।

৩. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ওয়াজিব।

৪. কেউ তাদের সাহায্য, তাকে তা দেওয়া ওয়াজিব।

৫. যারা যুদ্ধ করে না তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব তাদের সকলের।

৬. বিবাহ, উত্তারাধিকার, মসজিদ, নামাজে ইমামতি, জানাযায় নামাজে ইমামতি, মৃতকে গোসল দেওয়া, কাফন ও দাফন, জবাইকৃত পশু, কবরস্থান- এসবই সম্মিলিত অধিকার। এখানে মাযহাব দেখা যাবে না।

৭. যে মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হয়- হদ, রাষ্ট্রদ্রোহ অথবা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে- গনিমত হিসেবে তার সম্পদ দখল করা বৈধ নয়। তার স্ত্রীকে বাঁদি বানানো, সন্তানদেরকে হত্যা করা বা তাকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৮. মাযহাবের ভিন্নতার জন্য কাউকে গুপ্তহত্যা করা বৈধ নয়।

৯. জেনেশুনে কোনো মুসলমানদের নামে অপবাদ দেয়া বৈধ নয়।

১০. কোনো মহিলার শরয়ি উপায়ে বিয়ে হওয়ার পর অন্য কোনো পুরুষের তাকে বিয়ে করার সুযোগ নেই। যদি না স্বামী তাকে তালাক দেয় অথবা মারা যায় এবং ইদ্দত শেষ হয়।

১১. কেবল হিজরতের উদ্দেশ্যে ভিন্ন মাযহাবের লোকদের এলাকা ত্যাগ করা বৈধ নয়।

১২. যারা পরহেজগার মুসলমান, মাযহাবনির্বিশেষে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা তাদের প্রাপ্য।

১৩. পাপীলোক, মাযহাবনির্বিশেষে আল্লাহর জন্য তাকে ঘৃণা করা কর্তব্য।

১৪. পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে যারা মুসলমানদের কাছে নেককার, তাদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা কর্তব্য।

১৫. যাদেরকে ভালোবাসার জন্য বা ঘৃণা করার জন্য কুরআন-হাদিসে সরাসরি বলা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় বৈধ নয়।

১৬. কাবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিক নয়। তার সাথে মুশরিকদের মতো ব্যবহার করা যাবে না। সে মুসলমান, মুসলমানদের সকল

অধিকার সে পাবে। তবে তার জন্য ইস্তিগফার করা যাবে না, যদি সে তাওবা না করে এবং গুনাহে অবিরত থাকে।

১৭. ভিন্ন মাযহাবের অনুসারীরা কাফির নয়। তারা মুসলমান। তাদের ক্ষেত্রেও সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রযোজ্য। তবে সে যদি দ্বীনদার না হয়, তার জন্য ইস্তিগফার করা বৈধ নয়।

১৮. বিবাহ, তালাক, সন্তানপ্রতিপালন, ভরণপোষণের মতো পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে ফিকহি সাধারণ নীতি ও শরয়ি মানদণ্ডে স্বীকৃত সমাজনীতি অনুসৃত হবে।

১৯. নারী এবং তার চাচি বা খালাকে একই ব্যক্তি বিয়ে করতে পারবে না।

২০. ব্যভিচারকারী পুরুষ বা মহিলা বিবাহিত হলে তাদের শাস্তি মৃত্যু পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ। এটি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। রহিত কুরআন দ্বারা নয়।

২১. যে ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে যেনা করবে, সে তার জন্য স্থায়ীভাবে হারাম।

পূর্বোক্ত পয়েন্টসমূহে যে সকল সতর্কতা ও শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা জালিম রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আরোপিত। ন্যায়পরায়ণ শাসনব্যবস্থা হলে সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাথে কোনো সংকোচ ছাড়াই কাজ করা যাবে।

ইবাদি মাজহাব থেকে বিচ্ছিন্ন দলসমূহ

ইবাদি মাযহাব অন্যান্য ইসলামি মাযহাবগুলোর ব্যতিক্রম নয়। এই মাযহাবের আলিমদের মধ্যেও বিরোধ হয়েছে, একে অপরকে বুঝার চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় প্রত্যেকেই তার মতকে সঠিক মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকেন। অনেক সময় তারা পূর্ববর্তী আলিমদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। ফলে একেকটি বিষয়ে একাধিক মতের উদ্ভব হয়।

অন্য সকল মাযহাবের মতো ইবাদি মাযহাবের প্রথম অন্তর্বিরোধ

কী ছিল- তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে বিরোধ প্রথম হিজরি শতক থেকেই বিদ্যমান ছিল। জাবিরের অনেক মতের বিরোধিতা হয়েছে। বিপরীত মতের উপর মাযহাবের আমল অদ্যাবধি চলমান। যেমনটা আবু হানিফা ও মালিকের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

ইবাদি ঐতিহাসিক রচনাবলি এবং মতবাদ বিষয়ে তাদের লিখিত বইপত্র থেকে জানা যায়, প্রথম সত্যিকারের বিরোধ হয়েছিল আবু উবাইদার সময়ে। তার সহপাঠীদের মধ্যে তিনজন (আতিয়্যাহ, আবু হামযা আল কুফি ও গইলান) কদারিয়্যাদের মত গ্রহণ করেছিলেন। আবু উবাইদা তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ফলে ইবাদিরা তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং তারা অন্যান্য দলে যোগদান করে। এটি ছিল ব্যক্তিবিশেষের বিরোধ, যারা পরে সেই ভিন্ন মতের লোকদের দলে যোগ দিয়েছিল।

এরপর আবু উবাইদার একদল ছাত্র তার বিরোধিতা করেন। এরা হলেন সাহল ইবনু সালিহ, আবুল মা'রুফ শুয়াইব ইবনু মা'রুফ, আবদুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযিয, আবুল মুয়াররিজ উমার ইবনু মুহাম্মাদ আল কুদামি। তারা তাদের উস্তাযের সাথে বেশ কয়েকটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। উস্তায তাদেরকে তাওবা করিয়েছিলেন। যদিও আবু উবাইদার মৃত্যুর পর তারা আবার সেই মতগুলো গ্রহণ করেছিলেন। সেই বিষয়গুলো হল: ১- জালিম শাসকের পেছনে জুমার নামাজ পড়া বৈধ নয়। ২- যে সকল মুসলমান এমনভাবে নুসুসকে ব্যাখ্যা করে, যা তাশবিহের মতো দেখায়- তারা মুশরিক। ৩- কোনো মহিলার যোনি ও পায়ুপথ ভিন্ন অন্যস্থানে যৌনক্রিয়া সম্পন্ন হলে সে মহিলার পাপ হবে না[৩]।

---

৩ তৃতীয় হিজরিতে হারুন ইবনুল ইয়ামান এই মতগুলো প্রচার করেছিলেন। আল্লামা মাহবুব ইবনুর রুহাইল তার সাথে এ নিয়ে মুনাযারা করেছেন। তাদের এই মুনাযারা ইমাম মুহাম্মা ইবনু জাইফারের কাছে পৌঁছায়। ইমাম

আবু উবাইদা এবং রবি' ইবনু হাবিবের সময়ে যে সকল বিরোধ হয়েছিল, তা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলো ইবাদি মাযহাবে কোনো উপদলের সৃষ্টি করেনি। আলাদা কোনো ফেরকাও তৈরি করেনি। হ্যাঁ, 'কাদার'-এর মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে তারা ভিন্নমত পোষণ করে কাদারিয়্যা ও মুতাযিলাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। রবি' ইবনু হাবিবও তার কিছু ছাত্রকে ইলমি হালাকা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। তাদের সাথে কিছুটা কঠিন আচরণ করা হয়েছিল। তবে তাদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনা ও ইলম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা সামান্য বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবাদি মাযহাবের অনুসারীই ছিল।

ইবাদি ঐতিহাসিক ও মতবাদ বিষয়ে লেখা বইয়ের লেখকেরা পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের নামে কোনো ফেরকার নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু তারা ইবাদি চিন্তা থেকে উদ্ভূত ছয়টি উপদলের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য মাযহাবের লেখকরা এ ছয়টি দলের কথা উল্লেখ করেননি। এটির কারণ তারা ইবাদি মাযহাব সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন না। নিম্নে এ ছয়টি দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:

১. নুক্কার:

এটি নিছক রাজনৈতিক কারণে তৈরি হয়েছিল। যদিও পরে তারা মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ে বিভিন্ন মত গ্রহণ করে একটি নতুন ইসলামি আকিদাগত দল হয়ে ওঠে। এর প্রতিষ্ঠাতা সাবেক ইবাদি বলে একে ইবাদি মাযহাবের শাখা বলা ভুল।

আবু কুদামাহ ইয়াযিদ ইবনু ফিন্দিন আল ইয়াফরিনি। আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আব্দির রহমান আর রুস্তুমির হাতে বাইয়াত গ্রহণের

এবং তৎকালীন আলিমরা শায়খ মাহবুবের মতকে সঠিক হিসেবে ঘোষণা করেন।

পর তিনি তার ইমামতকে অস্বীকার করেছিলেন। তার এ সিদ্ধান্তের পেছনে দুটি যুক্তি ছিল: ১- অধিক উপযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে কম যোগ্যতাসম্পন্নের ইমামত শুদ্ধ নয়। আর সে সময় আব্দুল ওয়াহহাবের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। ২- বাইয়াত গ্রহণের আগে তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে, আব্দুল ওয়াহহাবকে অবশ্যই একটি পরামর্শসভা গঠন করতে হবে এবং এর সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। যে শর্তটি বাস্তবে পূরণ হওয়া সম্ভব হয়নি। সে জন্য তিনি আব্দুল ওয়াহহাবের ইমামতকে বাতিল ঘোষণা করেন।

পূর্বোল্লিখিত শুয়াইব ইবনু মারুফও আবু কুদামার দলে যোগ দেন। ক্রমেই তারা সশস্ত্র পদক্ষেপের দিকে এগুতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা অতর্কিতে রাজধানী তিহার্তের উপর আক্রমণ করে বসেন। সে সময় ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু ইমামের বাহিনী আক্রমণকারীদের রুখে দিতে সক্ষম হয়। এতে আবু কুদামা স্বয়ং নিহত হন। শুয়াইব লিবিয়ায় পালিয়ে গিয়ে নিজের পক্ষে লোক জড়ো করতে থাকেন। এরপর রাজনৈতিক বিরোধিতার পাশাপাশি উস্তায আবু উবাইদার বিরুদ্ধে গিয়ে তারা যে সকল ধর্মীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, তাও এর সাথে যোগ হয়। তাদের এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। একসময় মাশরেক থেকে আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ আল ফাযারি এসে তাদের সাথে যোগ দেন, যিনি বহু বিচ্ছিন্ন চিন্তা বহন করছিলেন। ফলে নুক্কাররা বহু বিভ্রান্ত মত নিয়ে গড়ে উঠলো একটি নতুন ফেরকা হিসেবে।

তাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিশ্বাসগুলির মধ্যে ছিল: ১- আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও ঘৃণা অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। ২- কোনো বিষয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত দায় সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ না সকল মুসলমান একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। ৩- আল্লাহর নামসমূহ মাখলুক। এ ধরনের বিশ্বাসের সংখ্যা বিশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

২. হুসাইনিয়্যাহ:

আবু যিয়াদ আহমাদ ইবনুল হুসাইন তরাবলুসি তৃতীয় হিজরি শতকের মানুষ। তিনি এই ফেরকার প্রতিষ্ঠাতা। ইসা ইবনু উমাইর প্রতিষ্ঠিত 'উমাইরিয়্যাহ' ফেরকার অনেক চিন্তা ও বিশ্বাস তারা গ্রহণ করেছিল। তারা সম্ভবত প্রথমে একই দল ছিল। পরে একটিকে ইবাদিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, অন্যটিকে মুতাযিলাদের সঙ্গে। এদের আন্দোলন নুক্কারদের চিন্তার সাথে মিলে গিয়েছিল। এজন্য এরা একে অপরকে ইবাদিদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিল। মতবাদ বিষয়ে লিখিত বইসমূহে এদের অনেক মতামত তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হল:

১- আল্লাহকে বিশ্বাস করার পর নবি, কিতাব, পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম- যা কিছুকেই অস্বীকার করা হোক; ব্যক্তি কাফির হবে না।

২- উম্মতের যারা ভিন্নমত পোষণ করে, তাদের কাছে যদি এর ব্যাখ্যা থাকেও- এরা মুশরিক।

৩- মুহাম্মাদ (সা.)- কে না জানলেও কোনো সমস্যা নেই।

৩. সাক্কাকিয়্যাহ:

আবদুল্লাহ সাক্কাক লাওয়াতি এই ফেরকার জনক। তার পিতা একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই তাকে একজন শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করেন, যিনি তাকে কুরআন মুখস্ত করান। পরবর্তীতে তিনি নানা বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। অলঙ্কার তৈরিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অচিরেই তিনি বিরাট ধনী হয়ে ওঠেন। ফলে তার মধ্যে বিখ্যাত হওয়ার মানসিকতা জন্ম নেয়। তিনি কিছু অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করেন, যার ফলে মুসলমানরা তিনি এবং তার অনুসারীদেরকে মুশরিক ঘোষণা করেন। তার ভয়াবহ বিশ্বাসের মধ্যে ছিল:

১- হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের কোনো ভিত্তি নেই।

২- আযান এবং জুমার নামাজ বিদয়াত।

৪. নাফফাসিয়্যাহ:

এই ফেরকার নেতা ফারাজ ইবনু নাসর আন নাফফাসি। তিনি ব্যাপক জানাশোনা সম্পন্ন, অত্যন্ত মেধাবী একজন আলিম ছিলেন। 'তিহার্তের' ইমামদের কাছে তিনি ইলম শিখেছিলেন। জাবালে নাফুসা এলাকার গভর্নর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। তার কাছে মনে হল শূন্যপদে তার সমবয়সী অন্য একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যে তার চেয়ে মেধা, জ্ঞান ও যোগ্যতা সবকিছুতেই পিছিয়ে। উপেক্ষার অনুভব তাকে ইমাম আফলাহের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি ইমাম আফলাহের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালান এবং তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোও সমালোচনার লক্ষবস্তু করেন।

ইমাম আফলাহ তার এই কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে চুপ থাকার এবং তাওবা করার আহ্বান জানান। অন্যথায় শাস্তির হুমকি দেন। ফারাজ বাগদাদে চলে আসেন এবং আব্বাসিদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এ পর্যায়ে তিনি হতাশ হয়ে ফিরে যান এবং ইমাম আফলাহের সমালোচনা ত্যাগ করেন। তার উল্লেখযোগ্য চিন্তাসমূহ হল:

১- উত্তরাধিকার সম্পদে আপন ভাতিজা সৎ ভাইয়ের চেয়ে অগ্রগণ্য।

২- তীব্র ক্ষুদা নিবারণের জন্য কোনো কিছু বিক্রয় করলে তার বিক্রয় কার্যকর হবে না। বরং যে সামর্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তার উপর ওয়াজিব ক্ষুদার্তের ক্ষুদা নিবারণ করা।

৩- তিনি জুমার খুতবাহকে অস্বীকার করেন এবং এটিকে বিদয়াত ঘোষণা করেন।

৫. ফারছিয়্যাহ

এটি প্রতিষ্ঠিত হয় আবু সুলাইমান ইবনু ইয়াকুব ইবনু আফলাহের হাতে। তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম ছিলেন। খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিচ্ছিন্ন ফতওয়া দিতে শুরু করেন। এজন্য তার

সময়ের আলিমরা তার সাথে দূরত্ব তৈরি করেন। তার পিতা তার সাথে কঠোর আচরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য মত ছিল:

১- হালাল প্রাণীর মল অপবিত্র এবং এটি জ্বালিয়ে খাবার তৈরি করা হলে, সেই খাবারও অপবিত্র।

২- পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা খাওয়া হারাম।

৩- পশুর রগের রক্ত হারাম; যদিও জবাইকৃত পশুকে ধুয়ে নেওয়া হয়।

৪- অপবিত্র শরীরবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ঋতুগ্রস্ত নারীর ঘাম অপবিত্র।

৬. খলাফিয়্যাহ:

খলাফ ইবনু আবিল খত্তাব আল মায়াফিরি এর প্রধান। তার পিতা রুস্তুমি রাষ্ট্রের পক্ষে পূর্ব লিবিয়ার গভর্নর ছিলেন। তার হঠাৎ মৃত্যু হলে লোকজনের অনুরোধে খলাফ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না করেই গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হলে তিনি লিবিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে তার বিশাল সমর্থকগোষ্ঠী তৈরি হয় এবং তিনি দীর্ঘদিন শাসনক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হন। অবশেষে তাকে পরাস্ত করা হয়। রাজনৈতিক এই বিচ্ছিন্নতা ছাড়া মূলত দলটির আলাদা কোনো আদর্শ বা মতামত নেই।

ইবাদিদের থেকে বিচ্ছিন্ন দলগুলো নিয়ে সংক্ষেপে বলতে গেলে নুক্কাররা আলাদা একটি ফেরকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বকীয় চিন্তা রয়েছে। এটির এই রূপান্তরের পেছনে ছিলেন শুয়াইব ইবনুল মারুফ। এজন্য এটিকে ইবাদিদের উপদল না বলে সরাসরি স্বতন্ত্র ফেরকা গণ্য করাই যৌক্তিক।

অন্যদিকে হুসাইনিয়্যাহ এবং সাক্কাকিয়্যা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত দুটি দল। কারণ তারা সুন্নাহ এবং ইজমাকে অস্বীকার করেছিল; এমনকি রসূল, ফিরিস্তা, জান্নাত, জাহান্নামের উপর ঈমান

আনাকেও তারা অস্বীকার করেছিল। রসূলকে জানা জরুরি নয়- এই ছিল তাদের মত। এ দুটি দলের প্রবক্তারা ইবাদি পরিবারের সন্তান হলেও তারা ইবাদিদের আদর্শকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে। তাদের বিচ্ছিন্নতার রাজনৈতিক কারণ আমাদের জানা নেই। তবে তারা এবং নুক্কাররা বিভিন্ন ইসলামি ফেরকায় বিদ্যমান অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন মতামত আপন করে নিয়েছিল। এরা খ্যাতি বা নেতৃত্বের জন্য মুখিয়ে ছিল। এবং সমাজের চিরচেনা ধারা থেকে বের হওয়ার জন্য যা কিছুই অদ্ভুত পেয়েছিল গ্রহণ করে নিয়েছিল। এভাবেই শুয়াইব, আবু যিয়াদ এবং সাক্কাকের দল গড়ে উঠেছিল। এদের অবশ্য দ্রুত পতনও হয়েছিল।

খলাফিয়্যাদেরকে ধর্মীয় ফেরকা বলা যায় না। তারা নিছক রাজনৈতিক কারণে 'তিহার্ত' ভিত্তিক ইমামত পরিচালিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এর প্রবক্তা ধর্মীয় কোনো নেতা ছিলেন না। তারাও সময়ের ব্যবধানে দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গেছে।

এ দলগুলোর সব কটিই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এদের সম্পর্কে কেবল সামান্য কিছু তথ্য আছে অন্যান্য মাযহাবের ঐতিহাসিকদের লেখা বইয়ে। একমাত্র ইবাদিরাই তাদের মধ্যপন্থা ও মৌলিকত্ব নিয়ে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয় পাঠক, বিভিন্ন বিষয়ে ইবাদিদের মতামত উল্লেখ করতে গিয়ে আমি কিছু আলোচনা উপেক্ষা করেছি। যেগুলো দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রসারতা, গোঁড়ামি, প্রতিহিংসা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, স্থবিরতার জন্য ইবাদিদের নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা করতে গেলেই কেবল আসে; দূর অতীতের সমাজবাস্তবতার নজির হিসেবে। যা হয়তো তখনকার কোনো ইবাদি আলিমের ব্যক্তিগত মত অথবা বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কারণে গড়ে ওঠা প্রতিক্রিয়া। প্রত্যেকটা মাযহাবের ইতিহাসেই এসব তিক্ত অধ্যায় মুছে ফেলা হয়েছে।

ইবাদি মাযহাবের উজ্জ্বল অবস্থান

ঐতিহাসিকভাবে ইবাদি মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় আগে গঠিত হয়েছে। আর এটির গঠন প্রক্রিয়া অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে ভিন্ন নয়। মুসলমানদের একজন প্রখ্যাত ইমাম, বিশিষ্ট তাবিয়ি জাবির ইবনু যাইদের কাছে একত্র হয়েছিলেন ইলমপিপাসুরা। তার হালাকায় প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন শেষে তারা ছড়িয়ে পড়তেন দিকদিগন্তে। তার প্রথম সারির ছাত্ররা তার অনুকরণে ইলমি হালাকা প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে দূরদূরান্তের ছাত্ররা পড়াশোনা করতো এবং উস্তাযের মতামত ও বর্ণিত হাদিসকে সংরক্ষণ করতো। এরপর সময়ের পরিক্রমায় এটি একটি সুশৃঙ্খল ও পরিণত রূপ পায়। জনতার আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করে।

সকল মাযহাবের ক্ষেত্রে এই একই অভিন্ন প্রক্রিয়া বিদ্যমান। চাই সেটি প্রথম যুগের তাবেয়িদের মাধ্যমে শুরু হোক অথবা পরবর্তী কোনো যুগের লোকজনের মাধ্যমে। এই যেমন, ইবনু তাইমিয়া এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব।

জাবিরের হালাকায় যে সকল মেধাবী শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়েছেন, তাদের শীর্ষে ছিলেন কতাদা, আইয়ুব, ইবনু দিনার, হাইয়ান আল আরাজ, আবুল মুনযির তামিম ইবনু হুয়াইস। এদের কেউ আবার ইলম অন্বেষণের বেশীরভাগ সময় জাবিরের হালাকায় কাটিয়েছেন। যেমন, আবু উবাইদা মুসলিম ইবনু আবি কারিমাহ, দিমাম, আবু নুহ আদ দাহহান, রবি' ইবনু হাবিব ও আবদুল্লাহ ইবনু ইবাদ। তাদের অনেকে শিক্ষা অর্জনের সময় থেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় যুক্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনু ইবাদ শান্তিপূর্ণ পন্থায় উমাইয়া শাসকদের বিরোধিতা করেছেন[৪]।

---

৪ ঐতিহাসিকদের অনেকে আবদুল্লাহ ইবনু ইবাদকে শেষ উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদের আমলে বিদ্রোহকারী হিসেবে তুলে ধরেছেন।

অনেকে শিক্ষাদানে মশগুল হয়েছেন। যেমন, আবু উবাইদা এবং আবু নুহ। ইবাদি আন্দোলনের জন্মলগ্ন ছিল উমাইয়া শাসনের সবচেয়ে শক্তিময় সময়। তারা সব ধরনের সমালোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ভীতিকর পরিস্থিতিতে হাসান বসরি এবং সাইদের মতো জাবির ইবনু যাইদও শাসকদের নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তারা তাদের মজলিসে কখনো কখনো আকারে ইঙ্গিতে শাসকের সমালোচনা করতেন। রাষ্ট্র তাদের কর্মকাণ্ডে কঠোর নজরদারি আরোপ করেছিল। তাদের এই সমালোচনা যেন সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে না পড়ে- সে জন্য তাদের চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। এজন্য রাষ্ট্র তাদেরকে খারেজি বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। এটি বর্তমান সময়ে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বা 'গাদ্দার' বলে দাগিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার। এই কাজে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। খুব সহজেই যাকে তাকে দোষারোপ করা যায়, তার কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় অথবা তাকে কায়দা করে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়।

জাবির ইবনু যাইদের মতো ইমাম মালিককেও খারেজি বলা হয়েছিল[৫]। এর মাধ্যমে তাদের মনে ভীতিসঞ্চার করা হয়েছিল। রাষ্ট্র

অথচ এটি ঐতিহাসিকভাবে ভুল। কারণ ইবনু ইবাদ আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের সময়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিনি বয়সে জাবিরের চেয়ে বড় ছিলেন। মাযহাবটি তার নামে উমাইয়ারা নামকরণ করেছিল। কারণ রাজনৈতিক অঙ্গনে ইবনু ইবাদ সোচ্চার ছিলেন।

৫ বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল আব্বাস আল মুবাররিদ আল-কামিলে (২/১৫৯) উল্লেখ করেছেন, 'তারা মনে করতেন, মুনযির ইবনুল জারুদ এবং ইয়াযিদ ইবনু আবি মুসলিম খারেজি চিন্তা লালন করেন। শেষোক্তজন হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের মাওলা ছিলেন। ইরাকের রাষ্ট্রীয় অনুবাদকারী সালিহ ইবনু আব্দির রহমান সিজিস্তানিও খারেজি চিন্তাধারার ছিলেন। ইবনু আব্বাসের মাওলা ইকরিমা এবং মালিক ইবনু আনাসের ব্যাপারেও একই কথা প্রচলিত। বলা হয়, মালিক উসমান, আলি এবং যুবাইরের নাম নিয়ে

তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ করতে চাইলে তার অজুহাত আগ থেকেই মজুত ছিল। ফলে জনগণের কাছে তাদের বিষয়ে কোনো বিবৃতি প্রদানের প্রয়োজন ছিল না।

চিন্তা ও আখলাকের দিক থেকে ইবাদি মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের মতো তার বিভিন্ন স্তরের আলিম ও চিন্তাবিদদের নিয়ে গঠিত। একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। অন্য সকল মাযহাবের আগেই এটি সাংস্কৃতিক বয়ান নির্মাণ এবং হাদিস ও ফিকহ সঙ্কলন প্রস্তুতকরণ সম্পন্ন করেছিল। নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো পড়লে পাঠক বুঝতে সক্ষম হবেন সকল মাযহাবের মধ্যে ইবাদিদের অবস্থান কতটা উজ্জ্বল।

১- ইবাদিদের মতে, আকিদা, আখলাক, ফিকহ ও লেনদেনে মূল ভিত্তি হল কুরআনে কারিম। এর সামান্য একটি হরফও অস্বীকার করা রিদ্দত এবং শিরক।

২- দ্বিতীয় উৎস হল সহিহ হাদিস। এর মধ্যে মুতাওয়াতির বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে যা বর্ণিত, তার নির্দেশনা যদি অকাট্য হয় তবে তা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব এবং সেটি আকিদায়ও প্রযোজ্য। এর অস্বীকারকারী কুরআন অস্বীকারকারীর মতোই কাফির। 'মশহুর' এবং 'মুস্তাফিয' হল মুতাওয়াতিরের চেয়ে নিম্নস্তরের। সেটি অনুযায়ী

বলতেন, ওরা গোস্তে ডোবা রুটির জন্য লড়াই করেছিল। আর হাসান বসরি খারেজিদের মতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে তিনি সরকারের সমালোচনা করতেন।'

ইবনু আবিল হাদিদ শরহু নাহজিল বালাগায় লিখেছেন, 'আমিরুল মুমিনিন আলি মিথ্যা বলেন নি। খারেজিরা আগত প্রজন্মেও বিদ্যমান থাকবে। সে অনুযায়ী খারেজি মতে বিখ্যাত ছিলেন ইকরিমা এবং মালিক ইবনু আনাস। এই ধরনের মত জাবির ইবনু যাইদ, আমর ইবনু দিনার এবং মুজাহিদেরও।' এ বিষয়ে আরও অনুরূপ তথ্য পেতে ইবনু আব্দি রব্বিহির আল ইকদুল ফারিদ এবং আবুল ফারাজের আল আগানি দেখুন।

আমল করা ওয়াজিব। সেটি সম্ভাব্য দলিল না অকাট্য দলিল এ নিয়ে মতভেদ আছে। খবরে ওয়াহেদ তথা একক বর্ণিত হাদিসের নির্দেশনা সম্ভাব্য। এটি আমলকে আবশ্যক করে। মুরসাল যদি সাহাবি বা তাবেয়ির হয় তবে সে অনুযায়ী আমল করাও ওয়াজিব। যদিও মুরসাল খবরে ওয়াহিদের চেয়ে নিম্নস্তরের।

৩- তৃতীয় উৎস হল ইজমা। উসুল ফিকহে নির্ধারিত শর্তসমূহ পূর্ণ হলে এটি গ্রহণ করা আবশ্যক। এটি ত্যাগ করা ফাসেকি। এটির প্রামাণ্যতা অকাট্য। ফকিহদের সবার সরাসরি বক্তব্য বা কারো কারো মৌন সম্মতিসহ ঐকমত হতে পারে। এবং ইজমা সব যুগেই হতে পারে।

৪- চতুর্থ উৎস হল কিয়াস। এটির নিয়মাবলি উসুলুল ফিকহের কিতাবাদিতে স্পষ্ট আছে।

৫- পঞ্চম উৎস হল ইস্তিদলাল। এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। এবং মাসালিহে মুরসালা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত মালেকিদের পরে এটি সবচেয়ে গুরুত্ব পায় ইবাদিদের কাছে।

আকিদা:

ইবাদিরা মনে করে তিনটি বাক্য স্বীকার করা ব্যতীত কেউ মুসলমান হতে পারে না। এগুলো হল অংশীদারবিহীন একমাত্র উপাস্য হিসেবে আল্লাহকে মেনে নেওয়া, মুহাম্মাদ (সা.) কে আল্লাহর বান্দা ও রসূল হিসেবে মানা এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবটুকু মানা। সাথে সাথে এ তিনটি বাক্যের বিস্তারিত নির্দেশনা বিশ্বাস করা।

আল্লাহর ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসের মূল ধারণা হল সীমাহীন পবিত্রতা। তার কোনো সদৃশ নেই, তিনিও কারো সদৃশ নন। কুরআন ও হাদিসের যে সকল অংশ বাহ্যিকভাবে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করে বলে মনে হয় তা এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যা অর্থময় হয় এবং বান্দার সাদৃশ্যমুক্ত হয়। তারা আল্লাহর অনুপম নামসমূহ

সাব্যস্ত করে এবং তার সিফাত বা গুণসমূহকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবেই বিশ্বাস করে।

কদার:

ইবাদিদের মতে, ভাগ্যের ভালো মন্দ সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকে- এই বিশ্বাস ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। এবং বান্দার কাজগুলো আল্লাহর সৃষ্টি, বান্দা সেগুলো অর্জন করে। জবারিয়্যাহ এবং কদারিয়্যাদের বক্তব্য থেকে তারা নিজেদেরকে মুক্ত রাখে।

কাবিরা গুনাহ:

কাবিরা গুনাহের ব্যাপারে তাদের অবস্থান তাই, যা হাসান বসরি এবং জাবির ইবনু যাইদের। তারা তাদেরকে খারেজিদের মতো মুশরিক বলে না। তারা বলে, সে মুনাফিক। অবিরত কাবিরা গুনাহ করে জান্নাতে প্রবেশ করা অসম্ভব যদি তাওবা না করে। নাফি' ইবনুল আযরাক এই ব্যাপারটি আলোচনায় আনার পর সম্ভবত এ নিয়ে সবচেয়ে তীব্র বিসংবাদ হয়েছিল খারেজি এবং ইবাদিদের মধ্যে।

ফিকহ:

এ ক্ষেত্রে ইবাদি মাযহাব জাহেরি ও হাম্বালি এবং হানাফিদের মাঝামাঝি ধরনের। ইবাদি মাযহাবের জন্ম ইরাকে হলেও তারা হানাফি ও মুতাযিলাদের মতামতকে শতভাগ গ্রহণ করেননি। ইবাদিরা কুরআনের পর মুতাওয়াতির, মশহুর, মুস্তাফিজ হাদিস এবং তারপর খবরে ওয়াহেদ এবং সাহাবি ও তাবেয়িদের মুরসালের মর্যাদায় বিশ্বাসী। হাদিস এবং কিয়াসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তারা হাদিসকে অগ্রগণ্য মনে করেন। যদিও সেই হাদিস খবরে ওয়াহেদ বা মুরসাল হয়।

খবরে ওয়াহেদকে তখনই কেবল ত্যাগ করা হয় যখন এটি অকাট্য দলিলের বিরোধী হয়। তারা কিয়াস, ইস্তিসহাব এবং

মাসালিহে মুরসালাকে উৎস হিসেবে গণ্য করেন। যার বিস্তারিত উসুলুল ফিকহের কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে।

আত্মশুদ্ধি:

ইবাদিরা ইসলামের যাবতীয় নীতিশিক্ষা ও শুদ্ধিপদ্ধতিকে পুরোপুরি লালন করেন। এর কিছু দিক দেখে নেওয়া যাক।

১- তাদের মতে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব। সেই নীতি অনুযায়ী, যা কুরআন ও হাদিস ঠিক করে দিয়েছে।

২- আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মুসলমানদেরকে ভালোবাসা হয় এবং তার অবাধ্যতার জন্য তাদেরকে ঘৃণা করা হয়। এটি সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ব্যাপকভাবে পূর্ববর্তী সকল নেককার মানুষের জন্যও এই ভালোবাসা প্রযোজ্য। আর নির্দিষ্টভাবে এই ভালোবাসা তাদের প্রতি প্রদর্শন করবে, যারা ভালো হবার ব্যাপারে স্পষ্ট তথ্য আছে।

আর যাদের নাম জানা যায়; কিন্তু তাদের কাজের অবস্থা অজ্ঞাত। তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ 'ওয়ালা এবং বারা'- ব্যক্তিগত নিশ্চিত জানাশোনা অথবা নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। আবার যার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে নিতান্ত ধারণা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

৩- সকল মুসলমান অধিকার ও দায়িত্বে সমান। হ্যাঁ, তার জান্নাতপ্রাপ্তির জন্য দোয়া করা তখনই বৈধ হবে যখন সে দ্বীনকে পরিপূর্ণ পালন করবে এবং পূর্ণ তাকওয়াবান হবে। সে এই ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার অর্জন করবে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য।

তবে যে কোনো মুসলমানের হেদায়েতের জন্য দোয়া করা বৈধ। যেমন, আল্লাহ তোমাকে বিশুদ্ধ তাওবার সুযোগ দিন,

তোমাকে সুস্থতা ও নির্বিঘ্নতা দিন, তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন- এধরনের দোয়া নেককার ও পাপী সব ধরনের মুসলমানদের জন্য করা যায়।

৪- রাষ্ট্র জালিম এবং আল্লাহর বিধানকে প্রয়োগকারী না হলে মুসলমান সেই রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে পারে, বের হয়েও যেতে পারে। সে রাষ্ট্রে অবস্থান করলে আল্লাহর অবাধ্যতা হয় না এমন সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আনুগত্য করা কর্তব্য। আর ইবাদি মাযহাব ব্যতীত অন্য কোনো মাযহাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হলে সকল দায়িত্ব ও অধিকার তার জন্য সমানভাবে সাব্যস্ত হবে।

হ্যাঁ, অবশ্যই সে বিধান সেই মাযহাবের মোতাবেক হতে হবে। যেমন, ইবাদিদের মত হল লালনপালনের ক্ষেত্রে পিতৃত্বের দিক মাতৃত্বের দিক থেকে অগ্রগণ্য। যেমন, নানীর চেয়ে অগ্রগণ্য দাদা। অধিকাংশ মাযহাবের মতামত এর বিপরীত। এখন কোনো রাষ্ট্রের অনুসৃত মাযহাবে যদি মায়ের দিককে এগিয়ে রাখা হয় তাহলে ইবাদি মাযহাবের অনুসারীকেও তা মেনে নিতে হবে।

একইভাবে ইবাদি মাযহাবের মত হল দাদার উপস্থিতিতে ভাইয়েরা মিরাস পাবে না। অন্যান্য মাযহাবের মত হল দাদা এবং ভাইদের মধ্যে মিরাস ভাগ করে দেওয়া হবে। রাষ্ট্র অনুসৃত মাযহাব অনুযায়ী এই আইন থাকলে ইবাদিরা এটি মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই।

আমার মনে হয় এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ইবাদিদের অবস্থান বোঝার জন্য যথেষ্ট। তারা মধ্যপন্থার উপর আছেন। কিয়াসের মাধ্যমে হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেননি, আবার অত্যন্ত দুর্বল হাদিসকেও গ্রহণ করেননি। ইজমার ক্ষেত্রেও তাদের মতামত ভারসাম্যপূর্ণ। নির্দিষ্ট মাযহাব বা অঞ্চলের লোকদের ঐকমতকে

তারা দলিল হিসেবে গণ্য করেননি। যেমন, কেবল মক্কা ও মদিনাবাসির ইজমা বা শুধু মদিনাবাসির ইজমা।

আবার ইজমার সম্ভাব্যতা ও বিদ্যমানতাকেও তারা অস্বীকার করেনি। সাহাবিদের সময়ে মৌখিক ও মৌন ইজমা হয়েছে। আবার কিয়ামত পর্যন্ত এই ইজমা হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট মাযহাবের লোকদের ঐকমত একটি সম্ভাব্য দলিল। এটিতে ইজমার শক্তি নেই। এটিকে ইত্তিফাক বলা উচিত, ইজমা নয়।

কিয়াসের ক্ষেত্রে এর শর্তাবলি পূরণ হওয়ার শর্তে তারা এটিকে মেনে নিয়েছে। তবে এটিকে সহিহ হাদিস বাতিলের উপলক্ষ বানায়নি। অন্যদিকে তারা ইস্তিসহাব ও মাসালিহে মুরসালাকে প্রমাণ মনে করেন। আকিদার ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে বান্দার সাথে তুলনা করেন নি, আবার আল্লাহ তার জন্য যে সিফাত সাব্যস্ত করেছেন তাও অস্বীকার করেননি।

কদারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নেতিবাচক অবস্থান নেন নি। অর্থাৎ, তারা বান্দাকে বাধ্য ও ইচ্ছাহীন বলে নি। আবার বান্দা তার কাজের স্রষ্টা- সে কথাও বলে নি। কাবিরা গুনাহের ক্ষেত্রে তারা পাপীকে মুশরিক বলে নি। আবার মুরজিয়াদের মতো অবস্থানও নেয় নি, যারা বলে ঈমান আনার পর কোনো গুনাহই ক্ষতিকর নয়। যেন জান্নাত একটি হোটেল। আর এর চাবি মুরজিয়াদের হাতে।

এ পর্যায়ে পাঠক ইবাদি মাযহাবের ঐতিহাসিক ধারাক্রম, আদর্শ ও আখলাক সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। যা তাকে ইসলামি মাযহাবগুলোর মধ্যে ইবাদিদের অবস্থান বুঝতে সাহায্য করবে এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রোপাগান্ডা, গোঁড়ামি ও স্থবিরতার ফলে ইবাদি মাযহাব সম্পর্কে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ধারণা জন্মেছে তার অবসান ঘটাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলি ইয়াহইয়া মুয়াম্মার: -আল ইবাদিয়্যাহ বাইনাল ফিরাকিল ইসলামিয়্যাহ। -আল ইবাদিয়্যাহ ফি মাওকিবিত তারিখ।
২. নুরুদ্দিন আস সালিমি: -তুহফাতুল আ'ইয়ান। -শরহুল জামিয়িস সহিহ। -তলয়াতুশ শামস। -মাশারিকু আনওয়ারিল উকুল।
৩. আবুর রবি' সুলাইমান পাশা আল বারুনি: -আল আযহারুর রিয়াদিয়্যাহ। -মুখতাসারু তারিখিল ইবাদিয়্যাহ।
৪. আত তাহির আহমাদ আয যাবি: তারিখুল ফতহিল আরাবি।
৫. আবুল মুযাফফার আল ইসফারাইনি: আত তাবসির ফিদ দিন।
৬. আবুল কাসিম আল বাররাদি: আল জাওয়াহিরুল মুনতাকাত।
৭. বাকলি আব্দুর রহমান উমার: হাওয়াশি আলা মাতনিন নিল।
৮. আবু ইয়াকুব আল ওয়ারজালানি: আদ দালিল ওয়াল বুরহান।
৯. তিবগুরিন আল মালশুতি: আদ দিয়ানাত।
১০. আবু আমর উসমান ইবনু খলিফাহ: আস সুয়ালাত।
১১. আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া আল বারুনি: সুল্লামুল আম্মাতি ওয়াল মুবতাদিয়িন।
১২. ইবনু আবিল হাদিদ: শরহু নাহজিল বালাগাহ।
১৩. আবুল আব্বাস আদ দুরজিনি: তবাকাতুল মাশায়িখ।
১৪. আবুল হাসান আল আশয়ারি: মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন।
১৫. মুহাম্মাদ আস সালিমি ও নাজি আসসাফ: উমান; তারিখুন ইয়াতাকাল্লামু।
১৬. আব্দুল কাদির আল বাগদাদি: আল ফারকু বাইনাল ফিরাক।
১৭. আবু মুহাম্মাদ ইবনু হাযম: আল ফাসলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ি ওয়ান নিহাল।
১৮. আবু তাহির ইসমাইল আল জিতালি: কাওয়ায়িদুল ইসলাম।
১৯. আবু সাকিন আমির আশ শামমাখি: কিতাবুদ দিয়ানাত।
২০. আবুল আব্বাস আহমাদ আশ শামমাখি: কিতাবুস সিয়ার।
২১. একদল লেখক: আকিদাতুত তাওহিদ ওয়া শুরুয়ুহা।

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি ৩

বইটি লেখার ইতিবৃত্ত ৬

ইতিহাসের অলিন্দে ৭

বিস্তারের অঞ্চলসমূহ ১০

ইবাদিরা খারেজি নয় ১৪

রাজনৈতিক আদর্শ ১৮

ইবাদিদের আকিদা ২১

ইবাদিদের ফিকহের নীতি ২৩

সামাজিক সম্পর্ক নীতি ২৭

মাজহাব থেকে বিচ্ছিন্ন দলসমূহ ৩১

ইবাদি মাযহাবের উজ্জ্বল অবস্থান ৩৯

আত্মশুদ্ধি ৪৪

গ্রন্থপঞ্জী ৪৭

সূচীপত্র ৪৮